রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি কবি; তাঁর এই কবিসত্তার আলোর রোশনাই হয়ে উঠেছে বাংলা কাব্যজগৎ; তার সুদীর্ঘ জীবনব্যাপি কাব্যসাধনার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, .

"প্রাণ শক্তির এত প্রাচুর্য, আবেগের এত গভীরতা; রোমান্টিক মানুষের কল্পরাজ্যে পরিক্রমা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বাতীতের, সীমার সঙ্গে অসীমের, খন্ডের সঙ্গে পূর্ণের এই মিলনলীলা কোনো একজন কবির মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় না;"

সারাজীবনব্যাপি রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য কাব্য রচনা করেছেন; মাত্র ১২ বছর বয়সে 'অভিলাষ' নামক একটি কবিতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখার শুরু। কবিতাটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' ছাপা হয়েছিল। কথিত আছে বোলপুরে তিনি 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। তবে কবির প্রথম স্বাক্ষর যুক্ত কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার'; ১৮৭৫ সালে হিন্দুমেলায় পঠিত হয়েছিল; 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), 'ভানুসিংহের পদাবলী' (১৮৮৪)-তে প্রতিফলিত হয়েছে কবির কবিতার প্রতি তীব্র টান; 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ দেখা গেল কবির বিষন্নতা বোধ; অপরদিকে 'প্রভাতসঙ্গীত'-এ কবি খুঁজে পেলেন নিজেকে উন্মোচিত করবার প্রেরণা; তিনি উপলব্ধি করলেন—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগত আসি সেথায় করিছে কোলাকুলি;"

'ছবি ও গান' কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে জগত ও জীবন সম্পর্কে কবির অসাধারণ অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। তবে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে রবীন্দ্র প্রতিভা সর্বপ্রথম একটি সুসংহত, সুবিন্যাস্ত রূপ লাভ করেছে; এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হল — 'বিরহীর পত্র', 'বাঁশি', 'হৃদয় আসমান', 'পবিত্র প্রেম', 'সমুদ্র', এই কাব্যে প্রতিভাত হয়েছে কবির তীব্র জীবনাসক্তি—

"ম'রিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই;"

'মানসী'র কবিতাগুলিতে কবির প্রাণপ্রাচুর্য অপূর্ব ছন্দে তরঙ্গায়িত হয়েছে; এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হল— 'নিষ্ফল কামনা', 'সুরদাসের প্রার্থনা', 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি'; 'মেঘদূত'-কবিতাটি লেখার সময় কবির মনে কালিদাসের 'মেঘদূতম্' কাব্যের প্রভাব ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কবির চেতনার উপলব্ধিতে এই কবিতাটি বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসে এক অনন্য [illegible] হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে; 'মেঘদূত' বস্তুবিষয়ই কালিদাসের কাব্যের 'মাহাত্ম্য'; প্রমথনাথ বি. সি. লিখেছেন—

"এই কবিতা সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের মন এবং আধুনিক মন, কিন্তু ইহার কাব্যরীতিটি কালীদাসীয়;"

'সোনার তরী' কবিতাটির গ্রন্থ সংখ্যা ৪২; এই গ্রন্থটি কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনকে উৎসর্গ করেন; কাব্য শুরু হয়েছে 'সোনার তরী' কবিতা দিয়ে; কাব্য শেষ হয়েছে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা দিয়ে; চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"সোনার তরীতে কবি প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ; রবিরশ্মির মধ্যাহ্ন দীপ্তি বিচ্ছুরিত; সোনার তরী গ্রন্থে সমস্ত কবিতার মধ্যে কবির বিশ্বানুভূতি ও সৌন্দর্যানুভূতি প্রবলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে; সৌন্দর্যানুভূতির গভীর তন্ময়তার সৃষ্টি সোনার তরী;"

—'সোনার তরী' (১৮৯৪) কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হল- 'সোনার তরী', 'যেতে নাহি দিব', 'মানস সুন্দরী', 'বসুন্ধরা' ইত্যাদি; 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি সার্বজনীন সত্যরূপে -য় উদ্ভাসিত হয়; মানবআত্মার ক্রন্দনধ্বনি শোনা যায় এই কবিতায়—

"এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন—'যেতে নাহি দিব'; হায়
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়;"

'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হল — 'নববর্ষে', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'জীবনদেবতা'; চিত্রা কবিতাগুলিতে দেখা গেল জীবন দেবতার উদ্ভাস; কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন দেবতা' সম্পর্কিত ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন —

" এই যে কবি যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবন দেবতা নাম দিয়াছি;"

১৮৯৬ খ্রী: প্রকাশিত 'চৈতালি' কাব্যে উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হল, 'খেয়া', 'তপোবন', 'ঋতুসংহার' ইত্যাদি; এই কাব্যের কবিতাগুলি রচিত হয় 'শিলাইদহ', পতিসর, সাজাদপুর এ বসে; এ গ্রামগুলির চারপাশে দরিদ্র লোকালয়ে কবি এমন পূর্ব বাংলার নিবৃত পল্লির মধ্যে নিজের খেলাঘর তৈরি করেছেন; কবি রবীন্দ্রনাথ ও জমিদার রবীন্দ্রনাথ একই মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন; বাংলার নদ-নদী, আকাশ, কাননবন, ধানক্ষেত, নদীর চর এমন কবিকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে, 'ক্ষণিকা' কাব্যটি ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়, এ কাব্যের কবিতাসংখ্যা ৬২; এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হল 'কৃষ্ণকলি', 'আষাঢ়', 'নববর্ষা'; 'নববর্ষা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পল্লিবাংলার অপূর্ব ছায়াছবি এখানে ধরা পড়েছে।

কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আত্মভাষণ রয়েছে, ব্যক্তিগত চিন্তা রয়েছে, কিছুটা সুরলাঞ্ছনও রয়েছে; অনেকাংশে বিষয় গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে; সর্বোপরি তার কবিতায় আত্মচিন্তার সঙ্গে কবির শিল্পবোধ, রসসৃষ্টির স্বার্থকতা ও আত্মনিমগ্নতা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ কবির মর্যাদা দিয়েছে।

বিহারীলাল চক্রবর্তীকে 'ভোরের পাখি' বলা হয় কেন? — তার তাৎপর্য বিচার করে আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের প্রতিষ্ঠায় তাঁর গুরুত্ব বিচার করো।

→ 'ভোরের পাখি' — যার আবির্ভাব সূর্যোদয়ের অনেকপূর্বে যে পাখির কাকলিতে একটি নতুন দিন আসে, সে দিন পূর্বে আসেনি। সেই পাখির কলকাকলি খুব বেশি লোকের শ্রবণে পৌঁছায় না, কারণ নিদ্রিত অবস্থান প্রায়, কিন্তু নয়, প্রভাতজাগী দু-একটি রসশ্রোতার কানে সেই গীত পৌঁছায়। ভোরে শোনা সেই পাখির কাকলি তাদের মুগ্ধ করে — সারাদিন ধরে তার অনুরণন চলে। বাংলা সাহিত্যে এই যথার্থ 'ভোরের পাখি' — বিহারীলাল চক্রবর্তী। তাঁর হাতেই এসেছে আধুনিক গীতিকবিতা। তাঁর এক শিষ্য লিখেছিলেন —

"এসেছিলে শুধু গানটিতে প্রভাতে
না ফুটিতে ঊষা, না পোহাতে রাতি॥"

— ভোরের পাখি একটি দিনের সূচনা করে মাত্র দিন আনে না। বিহারীলাল চক্রবর্তী যে দিনের সূচনা করে গেছেন — সে দিন এনেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলা কাব্য-কবিতায় যে নতুন সুর নিয়ে এলেন, সমকালে তা ছিল অভিনব — মহাকাব্যের যুগে বিলুপ্ত গীতিকাব্যের সুর। সংস্কৃত সাহিত্যের তিনি গভীর রসিক ছিলেন — বিশেষ করে বাল্মীকি, কালিদাসের কবিত্বে তিনি বিভোর ছিলেন। আবার অন্যদিকে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর আত্মীয়তা। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল—

(ক) 'সঙ্গীতশতক' — ১৮৬২ খ্রি:
(খ) 'নিসর্গসন্দর্শন' — ১৮৭০ খ্রি:
(গ) 'বন্ধুবিয়োগ' — ১৮৭০ খ্রি:
(ঘ) 'প্রেমপ্রবাহিনী' — ১৮৭১ খ্রি:
(ঙ) 'সারদামঙ্গল' — ১৮৭৯ খ্রি:
(চ) 'সাধের আসন' — ১৮৮৫ খ্রি:
(ছ) 'বাউল বিংশতি' — ১৯২৪ খ্রি:

— বিহারীলালের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন—

> "বিহারীলালের কবিতে প্রসাদগুণের অভাব নাই, ভাবের প্রকাশ আছে, তবে তাঁহার কাব্যসৃষ্টি খণ্ডঃ অপূর্ণ, অন্তরঙ্গ এবং তাঁহার জীবন ধ্যেয়ের আকাঙ্ক্ষিত।"
>
> ['বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'– তৃতীয় খণ্ড]

■ বিহারীলালের 'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যে প্রকৃতির একটা স্বাতন্ত্র্য পরিচয় ফুটে উঠেছে, বাংলা কাব্যে সম্ভবত এটি প্রথম। প্রকৃতিকে একটি পৃথক ব্যক্তিত্ব দিয়ে তার সঙ্গে চেতন কবিপ্রাণের সম্পর্ক স্থাপন — গীতিকাব্যের এক বড়ো বৈশিষ্ট্য, যার স্বাদ পাওয়া গেল বিহারীলালেরই কাব্যে। কবি বাস্তব জীবন ও নাগরিক ত্যাগ করে জলে-স্থলে, বনে-জঙ্গলে-কোটরে গড়া আদিম প্রকৃতির বুকে ফেরার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। 'বঙ্গসুন্দরী' — তে কয়েকটি নারীচরিত্র অঙ্কন করে তাদের মধ্য দিয়ে গৃহচারিণী নারীকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সৌন্দর্য স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে নারী প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনে জায়া, কন্যা বা ভগিনী রূপে উপস্থিত— তাকেই তিনি স্বর্গের ইন্দ্রাণী রূপে দেখেছেন।

■ 'সারদামঙ্গল' কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের জন্যই আধুনিক কাব্যের জনকরূপে বিহারীলালের প্রসিদ্ধি। তাঁর শিষ্যেরা, এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নানাভাবে মুগ্ধ হয়েছেন — প্রভাবিত হয়েছেন এই কাব্যে। পাশ্চাত্য রোমান্টিক ও গীতিক উভয়ের সমন্বয় রূপ এই কাব্য। 'সাধের আসন' কাব্যটি 'সারদামঙ্গল'-এর পরিপূরক। পাঁচটি সর্গে সারদার সঙ্গে কবির বিরহ-মিলনের চিত্র অঙ্কিত। সারদা কবির মানসপ্রিয়া রূপে বিশেষ, বিশ্ব সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী রূপে নির্বিশেষ। সারদার আবির্ভাবে কবির উল্লাস, অন্তর্ধানে বিষণ্ণতা, এই উল্লাস— বিষণ্ণতা, এই পাওয়া –না পাওয়ার জোয়ার-ভাটায় কাব্যটি একটি অনির্দিষ্টের ব্যঞ্জনায় শেষ হয়েছে। সারদাকে হারিয়ে কবি হাহাকার করে ওঠে—

"হারায়েছি হারায়েছি রে সাধের মানস ললনা,
মানস মরালি আমারে কোথা গেল বলনা।।"

— সারদার মধ্যে অনেকেই শেলির 'Hymn to Intellectual Beauty'- র সাদৃশ্য খুঁজেছেন, আবার অনেকে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার আভাস পেয়েছেন বিহারীলালের সারদার মধ্যে।

■ রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আর স্ত্রী কাদম্বরী দেবী বিহারীলালের ভক্তপাঠিকা ছিলেন, কবিও তাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। কাদম্বরী দেবী 'সারদামঙ্গল' পাঠ করে কবিকে একটি আসন তৈরি করে দেন, তাতে ছিল 'সারদামঙ্গল'- এর দুটি পংক্তি ——

"হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে ঢুলু ঢুলু দু-নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও?"

অর্থাৎ তিনি সারদার ধ্যান মূর্তির ব্যাখ্যা চেয়েছেন, কবিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন - তিনি অপর একটি কাব্যে এর ব্যাখ্যা দেবেন। কিন্তু কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক আত্মহত্যায় কবি অত্যন্ত ব্যথিত হন, ভক্ত পাঠিকাকে স্মরণ করে লেখেন 'সাধের আসন'; কাব্য হিসেবে এটি 'সারদামঙ্গল'-এর পরিপূরক ও কবির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদার-ই আরও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এতে দেওয়া আছে।

■ বিহারীলাল চক্রবর্তী আধুনিক বাংলা গীতি কাব্যের জনক রূপে চিহ্নিত ও স্বীকৃত। তাঁর কাব্য ভাষায় কিছু দুর্বলতা আছে কিন্তু কবি হিসেবে তিনি খাঁটি এবং অকৃত্রিম, পাশ্চাত্যে Lyric শব্দটি ঠিক যে অর্থে ব্যবহার করা হয় — তারই যথাযথ রূপায়ন বাংলা কাব্যে প্রথম বিহারীলালের। বিহারীলালের প্রভাব ছিল সমকালে অপরিসীম। বিহারীলাল নিজেই একটি কবিগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন, বাংলা কাব্যকে মহাকাব্যের জগৎ থেকে গীতিকাব্যের জগতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবিও বিহারীলালের শুধু অনুরক্ত ছিলেন না, প্রথম পর্বে ভাবশিষ্যও ছিলেন।

উনিশ শতকের বিশিষ্ট কবি মধুসূদন দত্তের অবদান লেখো.

→ ◪ বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব যদিও নাট্যকার রূপে, তবুও তাঁর প্রধান পরিচয় এবং শ্রেষ্ঠ পরিচয় কবি - মহাকবি. এক বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত জীবন নিয়েও তিনি যে অসাধারণ কাব্য সম্পদ উপহার দিয়েছেন — তা বাংলা কাব্যকে পাশ্চাত্যের যে কোনো উন্নত ভাষার কাব্যের সমতুল্য করে তুলেছে. তাঁর কাব্যচর্চার সময় দীর্ঘস্থায়ী নয়, সংখ্যাও অধিক নয়, তথাপি স্বল্পস্থায়ী এবং স্বল্পসংখ্যক কাব্যের জন্যই মধুসূদন বাংলা কাব্যকবিতায় চিরস্থায়ী আসন লাভ করেন. তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল —

ক) 'তিলোত্তমাসম্ভব' (১৮৬০)
খ) 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)
গ) 'ব্রজাঙ্গনা' (১৮৬১)
ঘ) 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২) এবং
ঙ) 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬).

◪ চোস্বরিচারে 'তিলোত্তমাসম্ভব' আখ্যানকাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা মধুসূদনের প্রথমকাব্য. কাব্যের কাহিনীটি মধুসূদন সংগ্রহ করেছেন ভারতীয় পুরাণ থেকে. ব্রহ্মার বরে বলীয়ান দেবদ্রোহী দুই দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয় সুন্দ - উপসুন্দকে হত্যা করার জন্য তিলোত্তমা অপ্সরা সৃষ্টি এবং তিলোত্তমার জন্য সুন্দ - উপসুন্দের পরস্পরে হননলীলায় মেতে ওঠা — এই কাব্যের বিষয়. এর পূর্বে, ১৮৫৮-য় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশ পেলেও 'তিলোত্তমাসম্ভব' এর মাধ্যমে যথার্থ বাংলা কাব্যের আধুনিকতার সূত্রপাত — ভাবে, পুরাণের পুনঃনির্মাণে এবং ছন্দে.

■ মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য'। এর কাহিনী বাল্মীকির রামায়ণ থেকে নিলেও জীবনদৃষ্টি সম্পূর্ণ আধুনিক। ন'টি সর্গে বীরবাহুর মৃত্যু থেকে মেঘনাদবধ এবং তার চিতায় প্রমীলার সহমরণ পর্যন্ত বর্ণিত। কাব্যের আরম্ভে বীররসের কাব্যরচনার প্রতিশ্রুতি দিলেও কাব্যটি করুণ রসে সিক্ত, মূলগত করুণ। ছবি উল্লিখিত পাশ্চাত্যের অনুসরণে মধুসূদনের কাব্যের নায়ক রাম বা লক্ষ্মণ নয়, রাবণ মতান্তরে ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ। মহাকাব্য রচনার প্রয়োজনে মধুসূদনের তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে রাম-লক্ষ্মণকে বিদেশী ব্রিটিশ শাসক এবং রাবণ মেঘনাদকে ভারতবাসী রূপে দেখা হয়েছে। মূল রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধের কারণ ছিল সীতাউদ্ধার, মধুসূদনের কাব্যে তা হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রাম। অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিপুণ প্রয়োগে, মহাকাব্যিক উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলংকারে, বিভিন্ন বর্ণনায়, চরিত্র নির্মাণে ভাষার গুরু গাম্ভীর্যে 'মেঘনাদবধ' যথার্থই সাহিত্যিক মহাকাব্য। মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট', ভার্জিলের 'ঈনিড', ট্যাসোর 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড', দান্তের 'ডিভাইন কমেডিয়া'-র পাশে 'মেঘনাদবধ' সাহিত্যিক মহাকাব্য হিসেবে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

■ মধুসূদনের কবিপ্রতিভা কত ব্যাপক ও গভীর ছিল, তার প্রমাণ 'ব্রজাঙ্গনা'। মেঘনাদের অশনিনাদ ও ব্রজাঙ্গনার বাঁশীধ্বনি একই সঙ্গে শুনিয়েছেন মধুসূদন। 'বৈষ্ণব পদাবলী'-র রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা এখানে নতুনভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দেশীয় ভাষা, ছন্দের উপর মধুসূদনের যে কত আয়ত্ত ছিল — এ কাব্যটি তার প্রমাণ। রোমান কবি ওভিদের 'The Heroides Epistle of the Heroines' পাঠ করে মধুসূদন পত্রকাব্য লেখেন 'বীরাঙ্গনা', ভারতীয় পুরাণ বা মহাকাব্য বর্ণিত নারীরা যে কথা বলতে পারেননি; মধুসূদন তাদের মুখে ভাষা দিয়েছেন। ওভিদের কাব্যে ২১টি পত্রের মতো মধুসূদনও ২১টি পত্র রচনার পরিকল্পনা করলেও, ১১টি রচনার পর কাব্যটি অসমাপ্ত থেকে যায়। অতীত স্মৃতির রোমন্থনে, কামনার তীব্রতায় আবেগের প্রচণ্ডতায় বা ধিক্কারে কাব্যের প্রতিটি চরিত্র স্বতন্ত্র

চিত্রিত। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পত্র — 'সোমের প্রতি তারা', 'নীলধ্বজের প্রতি জনা', 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী', 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', 'লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা' ইত্যাদি। গীতিধর্মিতা, নাটকীয়তা, অলংকার 'বীরাঙ্গনা'-কে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

■ সমগ্র উন্নত ভাষার সাহিত্যে গীতিকাব্যের একটি বিশেষ প্রকরণ সনেট, যেখানে নিজেকে উন্মোচিত করা যায়। মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'-তে বাংলা সনেটের জন্ম দিলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা'-র জন্য সারা ভারতের মহাকবির মুকুট একাকী ধারণ করেছেন, কিন্তু তার আত্মজীবনী থেকে হারিয়ে যাওয়া যদি কয়েকটি পৃষ্ঠার সন্ধান করতে হয় — তা এখানে মিলবে। কবির এক বিশেষ উপলব্ধির দিনে চতুর্দশপদীর জন্ম। পাশ্চাত্যের ভার্সাই নগরে অবস্থান করে কবির মনে পড়েছিল গ্রামের কথা, কপোতাক্ষ নদের কথা, নদী তীরে দেবদেউলের কথা, ভারতচন্দ্রের কথা, বিদ্যাসাগরের কথা। বাংলার কোলে আশ্রয় নেবার জন্য এই সব সনেটে তিনি বালকের মত কেঁদেছেন। তাঁর হৃদয়ে যে স্বদেশ প্রেম ছিল তার ও প্রকাশ এখানে। এখানকার 'আত্মবিলাপ' কবিতাটিকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিশুদ্ধ গীতিকবিতা ধরা হয়।

■ মধুসূদন কবিরূপে, মহাকবি রূপে সারাভারত আদৃত কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ নাট্যকার রূপে, তবে শুধু আত্মপ্রকাশের জন্য নয়, বাংলা কাব্য কবিতায় যেমন তিনি আধুনিকতার পথিকৃৎ — বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেও আধুনিকতার পথিকৃৎ মধুসূদন। (১৮৬০-১৮৬৬) মাত্র এই ক'বছর বাংলা কাব্যে মধুসূদনের পদচারণা। তার প্রত্যেকটি কাব্যই পৃথক পৃথক প্রকরণের। 'তিলোত্তমাসম্ভব' আখ্যানকাব্য, 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্য, 'ব্রজাঙ্গনা' দেশীয় রীতিযুক্ত গীতিকাব্য, 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্য, 'চতুর্দশপদী' মূলত সনেট। আর বাংলা মহাকাব্য, পত্রকাব্য এবং সনেটের তিনিই প্রবর্তক। এছাড়া ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি আঙ্গিক নিয়ে তিনি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, তারই সফলশ্রুতি পরবর্তী বাংলা কাব্য কবিতার এত সমৃদ্ধি ও প্রসার।